প্রথম আলো

কলাম

মতামত

শিবিরের বিজয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে কি নতুন ধারার সূচনা হলো

এবারের ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা, হুমকি, মারামারি কিংবা হাতাহাতির ঘটনা ঘটেনি। শান্তিপূর্ণ ডাকসু নির্বাচনের পর বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি একটি নতুন পদযাত্রার সূচনার দিকে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে লিখেছেন **সৈয়দা লাসনা কবীর, এস কে তৌফিক হক ও মোহাম্মাদ ঈসা ইবন বেলাল**

প্রকাশ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০: ০৫

ডাকসুর ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে বিজয়ী ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতারা (বাঁ থেকে) মো. আবু সাদিক কায়েম, এস এম ফরহাদ ও মুহা. মহিউদ্দীন খান। বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে *ছবি: জাহিদুল করিম*

বিগত ১৫ বছরে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ায়—এমনকি ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপক কারচুপির ফলে—একটি প্রজন্ম তাঁদের ভোটাধিকার সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ পাননি। ফলে একটি পুরো প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক চর্চা থেকে বঞ্চিত অবস্থায়।

এই পটভূমিতে ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে এমন একটি আবহ তৈরি হয়েছিল যে বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি একটি নতুন গণতান্ত্রিক পদযাত্রার সূচনার দিকে যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছিল, এই পদযাত্রা যত সুন্দর এবং সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের গণতন্ত্র ততটাই দৃঢ় ও নিশ্চিত হবে।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, গণতন্ত্রচর্চায় যে তাঁরা বদ্ধপরিকর—তা ডাকসু নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হয়েছে। নির্বাচনের সময় থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা, হুমকি, মারামারি কিংবা হাতাহাতির মতো ঘটনা ঘটেনি। ডাকসুর ইতিহাসে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এত ‘হাই-ইনটেনসিভ’ একটি নির্বাচনে সহিংসতা না হওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

এবারের ডাকসুতে প্রচলিত বাইনারি বিভাজন—যেমন ধর্ম, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ (বাঙালি বা বাংলাদেশি) কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শ—কোনোটিকেই নির্বাচনী প্রচারণায় প্রধান হাতিয়ার বানানো হয়নি; বরং প্রত্যেক প্রার্থী তাঁদের ইশতেহার সাজিয়েছিলেন ছাত্রকল্যাণকে কেন্দ্র করে। তাঁরা প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন ছাত্রদের মন জয় করার জন্য এবং নিজেকে ছাত্রদের সেবা করার উপযুক্ত প্রার্থী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য, অন্যকে হেয় করার চেয়ে তাঁরা নিজের যোগ্যতাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় বেশি সচেষ্ট ছিলেন।

শিবিরের ভূমিধস বিজয়

নির্বাচনের শুরু থেকেই শিবিরের একটি শক্তিশালী এবং সম্ভাবনাময় উপস্থিতি বিভিন্ন জরিপ ও আলোচনায় উঠে এসেছিল। ফল ঘোষণার পর দেখা যায়, সেই পূর্বাভাস যথার্থ ছিল। প্রায় ৮০ শতাংশ আসনে তারা বিজয় অর্জন করেছে। বিশেষত ভিপি, জিএস ও এজিএস—তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদে শিবির তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের অর্ধেকেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছে। যদিও ছাত্রদল, স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ অন্যরাও তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু ছাত্রশিবির যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে, তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলটির বিশেষ জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত দেয়। এই জনপ্রিয়তার মূল কারণ ও লক্ষ্য কী—সেটিই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

জুলাইয়ে শিবিরের ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারের নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের বিজয়ের পেছনে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে তাদের কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে আবু সাদিক কায়েমের নেপথ্যের শক্তিশালী অবস্থান, তার দীর্ঘদিনের ত্যাগ, সংগ্রাম এবং নেতৃত্ব শিক্ষার্থীদের কাছে গভীরভাবে

প্রভাব ফেলেছে। তার পাশাপাশি এস এম ফরহাদ, যিনি সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তিনিও শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি

শিবির এবারের নির্বাচনে নিজেদের কেবল 'শিবির' হিসেবে উপস্থাপন না করে, বরং ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। এই প্যানেলে হিজাবি ও 'নন-হিজাবি' ছাত্রী থেকে শুরু করে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি শিবিরের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলেছে।

এই কৌশল তাদের দুটি বড় সমালোচনা থেকে রক্ষা করেছে। প্রথমত, শিবিরকে নারীবিরোধী বা নারীবান্ধব নয় বলে যে অভিযোগ ওঠে, সেটি কার্যত ভেঙে গেছে। সাদিক কায়েমকে ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতে এবং আলোচনায় একসঙ্গে অংশ নিতে দেখা গেছে বিভিন্ন প্রচারণার ভিডিওতে। শিবির বলার চেষ্টা করেছে যে তাদের কাছে নারীদের জন্য 'হিজাব' বাধ্যতামূলক নয়। দ্বিতীয়ত, তারা কেবল ইসলামভিত্তিক বা একমুখী সংগঠন নয়; বরং তাদের দ্বার অন্য সব ধর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য খোলা।

অভিযোগ কম থাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারের নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের সাফল্যের পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অভিযোগের অভাব। বিগত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে শিবিরের কার্যক্রম নিয়ে তেমন কোনো গুরুতর অভিযোগ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শোনা যায়নি। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, বরং সারা দেশেই শিবিরের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযোগের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

অন্যদিকে ছাত্রদল কিংবা সম্প্রতি গড়ে ওঠা নতুন কিছু ছাত্রসংগঠনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উঠেছে—যেমন চাঁদাবাজি, সহিংসতা, হত্যাকাণ্ড এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। এই পটভূমিতে শিবির একটি বিশেষ সুবিধা পেয়েছে। শিক্ষার্থীরা সাধারণত যে সংগঠনগুলোকে অবিশ্বাস বা ভয়ের চোখে দেখেন, সেগুলো থেকে শিবির নিজেকে কিছুটা আলাদা করতে সক্ষম হয়েছে। অভিযোগের এই অভাব তাদেরকে ভোটারদের কাছে তুলনামূলকভাবে বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য সংগঠন হিসেবে উপস্থাপন করতে সহায়তা করেছে।

ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষা বুঝে রাজনীতি

শিবিরের জয়ের পেছনে আরেকটি বড় কারণ হলো তারা শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বোঝার চেষ্টা করে এবং তাদের দাবিকে সম্মান জানিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, আবাসিক হলগুলোতে যেন কোনো ধরনের রাজনীতি না চলে। এই দাবির পক্ষে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ঐকমত্য ছিল। কিন্তু ডাকসু নির্বাচনের ঠিক কদিন আগে ছাত্রদল যখন তাদের হলভিত্তিক কমিটি ঘোষণা করে, তখনই শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ দেখা দেয়।

অন্যদিকে শিবির বরাবরই হলে রাজনীতি বন্ধের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে এবং এই নীতিতে অটল থেকেছে। ডাকসুর আগে তারা কোনো হলভিত্তিক কমিটি ঘোষণা না করায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতি আস্থা রাখে।

বিভাগে ভালো ফল ও সহশিক্ষায় অংশগ্রহণ

ছাত্রশিবিরের এবারের বিজয়ের পেছনে অন্যতম একটি বড় কারণ হলো তাদের প্রার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ ফল এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ ধারণা ছিল যে রাজনীতিতে যুক্ত হলে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে এবং রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় শিক্ষার্থীরা একাডেমিক ফলাফলে পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে ছাত্রশিবির সেই ধারণাকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তারা দেখিয়েছে যে রাজনীতি করার পাশাপাশি একাডেমিক উৎকর্ষ ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ, ছাত্রশিবিরের ভিপি প্রার্থী আবু সাদেক কায়েম তাঁর ডিপার্টমেন্টে শীর্ষস্থান অধিকারীদের একজন। একইভাবে জিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থী এস এম ফরহাদও অনার্স ও মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি অর্জন করেছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি বিতর্কে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রভাবশালী সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

একইভাবে মহিউদ্দীন খান, যিনি শিবিরের আরেকজন প্রার্থী, তিনি অনার্স ও মাস্টার্স উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। ফলে বাস্তবে দেখা গেছে, শিবিরের প্রার্থীরা একদিকে যেমন পড়াশোনায় উৎকর্ষ অর্জন করেছেন, অন্যদিকে সহশিক্ষা কার্যক্রমেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা তাদের এবারের নির্বাচনে ভালো ফলের অন্যতম কারণ।

কোচিং সেন্টারের ভূমিকা

নির্বাচনে ভালো ফলের পেছনে ছাত্রশিবিরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো তাদের কোচিং সেন্টারভিত্তিক কার্যক্রম। প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ শিবির পরিচালিত বা শিবির-সংশ্লিষ্ট কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে ভর্তি হন। ধারণা করা হয়, শুধু এসব কোচিং সেন্টারের মাধ্যমেই প্রতিবছর প্রায় দুই হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় সফল হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন।

এমন পরিস্থিতিতে যখন কোনো শিক্ষার্থী শিবিরের সহায়তায় বা শিবির পরিচালিত কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, তখন তাঁদের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক ও আস্থার বন্ধন তৈরি হয়। তাই এবারের নির্বাচনে যখন তাঁরা ভোট দেন, তখন তাঁরা অনেকাংশেই কৃতজ্ঞতার মনোভাব থেকে হয়তো শিবিরকে সমর্থন করেছেন।

শিবিরের প্রতি ‘সহানুভূতি’

শিবিরের বিজয়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের প্রতি তৈরি হওয়া একধরনের সহানুভূতি বা সিমপ্যাথি। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রলীগ তাদের রাজনৈতিক প্রচারণায় শিবিরকে কেন্দ্র করে আক্রমণাত্মক স্লোগান ব্যবহার করেছে। এসব স্লোগান শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেই উসকে দেয়নি, বরং শিক্ষার্থীদের কাছে শিবিরকে একটি নিপীড়িত সংগঠন হিসেবে চিত্রিত করেছে।

এ ছাড়া বাস্তবে বহু শিক্ষার্থীকে প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে জোর করে 'শিবির ট্যাগ' লাগিয়ে শারীরিক নির্যাতন, মারধর এমনকি প্রাণঘাতী হামলার শিকার হতে হয়েছে। সবচেয়ে আলোচিত উদাহরণ হলো বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের হত্যাকাণ্ড। ফলে এ ধরনের নির্মম ঘটনা শিক্ষার্থীদের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং শিবিরের প্রতি একটি মানবিক সহানুভূতি সৃষ্টি করেছে।

ছাত্রদলের প্রার্থীদের পরাজয়ের কারণ

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে তাদের দেশব্যাপী নষ্ট হয়ে যাওয়া সুনাম। বাংলাদেশের খুব কম অঞ্চল রয়েছে যেখানে বিএনপি-সমর্থিত ছাত্রদল কিংবা যুবদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে কোনো প্রাণহানি ঘটেনি। একইভাবে তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগও বিদ্যমান।

আরেকটি কারণ হলো ডাকসুর ঐতিহাসিক ভূমিকা। ঐতিহাসিকভাবে ডাকসু সব সময়ই 'অ্যান্টি-এস্টাবলিশমেন্ট' শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছে, যারা সরকারে থাকে, তাদের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে ডাকসু।

শিক্ষার্থীরা ধারণা করতে পারেন যে ভবিষ্যতে বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে এবং একই সঙ্গে ছাত্রদল ডাকসুতেও প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে তারা সরকারের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেবে। এই আশঙ্কা থেকে শিক্ষার্থীরা মনে করেছেন, ছাত্রদল ক্ষমতায় এলে তারা হয়তো শিক্ষার্থীদের কথা না শুনে বরং দলের এবং সরকারের নির্দেশকেই বেশি গুরুত্ব দেবে। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আরও অসহায় হয়ে পড়বেন।

ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা ও দায়িত্ব

এবারের নির্বাচনের ফলাফলে যদিও ছাত্রশিবিরের প্যানেলের একক আধিপত্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এবং দেশের মানুষদের একটি যৌথ প্রত্যাশা রয়েছে। তা হলো নির্বাচনে বিজয়ী কিংবা পরাজিত, প্রত্যেক প্রার্থী যেন দেশের কল্যাণে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে অবদান রাখেন।

যাঁরা নির্বাচনে জিততে পারেননি, তাঁরাও চাইলে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে পারেন, তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারেন, বিভিন্ন দাবিদাওয়া সামনে আনতে পারেন এবং প্রয়োজনে আন্দোলনেও যুক্ত হতে পারেন। একইভাবে তাঁরা বর্তমান বিজয়ীদের ভুলত্রুটি গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারেন। এর মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্যও প্রস্তুত করতে পারবেন এবং দেশের জন্য কল্যাণমূলক কাজের অংশীদার হতে পারবেন।

অন্যদিকে যাঁরা নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন, তাঁদের কাছে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা আরও বড়। নির্বাচনের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করা তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশ, আবাসিক সমস্যার সমাধান, ছাত্রকল্যাণমূলক কার্যক্রম, গণতান্ত্রিক চর্চা ও নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ভবিষ্যতে অন্যান্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনকেও প্রভাবিত করবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যেখানে জেন-জি শিক্ষার্থীদের কাছে দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও সহিংসতার ছাত্ররাজনীতি প্রত্যাখ্যাত হয়ে একটি শিক্ষার্থীবান্ধব ছাত্ররাজনীতির নতুন দিক উন্মোচিত হবে।

- **সৈয়দা লাসনা কবীর** অধ্যাপক লোকপ্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- **এস কে তৌফিক হক** প্রফেসর ও ডিরেক্টর, সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
- **মোহাম্মাদ ঈসা ইবন বেলাল** গবেষণা সহযোগী, সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

* মতামত লেখকদের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো